শিশুর স্কুল ভীতি

পাঁচ বছর বয়স পার করে তার পরে স্কুলে যাওয়া। কয়েক দশক আগেও ছিল এই নিয়ম। কিন্তু এখন যুগ বদলেছে। দুই-আড়াই বছর বয়সেই মায়ের হাত ধরে বাচ্চারা আজ স্কুলের পথে। ছোট্ট শিশুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয় পাহাড় সমান হোমওয়ার্কের বোঝা। যদি শুরুতেই শিশুর পড়াশোনার ওপর ভীতি জন্মে যায় তবে পরবর্তী জীবনে লেখাপড়ার ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে ওঠে। ইদানীং বাচ্চার খেলাধুলার জগৎ বাড়িতে বাবা-মায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মনের কল্পনা প্রকাশ করলে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মব্যস্ত বাবা-মা তা হেসে উড়িয়ে দেন। কিন্তু সমবয়সী বা একটু বড় বয়সের শিশুদের সঙ্গে বাচ্চা খুবই সুন্দরভাবে রিঅ্যাক্ট করে। সর্বোপরি এই সঙ্গ প্রয়োজন বাচ্চার মানসিক বিকাশের জন্য। আর বাবা-মায়ের সাহচর্য তো অপরিহার্য। যৌথ পরিবার প্রথা আজকাল প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। তাই সমবয়সীদের সঙ্গও বাচ্চাদের ভাগ্যে আর জুটছে না। এ দিকটায় নজর দিলেই ছোট বয়সে শিশুদের স্কুলে পাঠানোর বিষয়টা গুরুত্ব পায় এবং শিশু-বিশেষজ্ঞরাও তাই মনে করেন।

বছর চারেকের বাচ্চাকে স্কুলে পাঠালে প্রথম প্রথম সে একটু কান্নাকাটি করবেই। প্রথমবারের মতো বাবা-মায়ের পরিচিত গণ্ডি ছেড়ে শিশু দিশেহারা হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে স্কুলের পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। কান্নাও যায় থেমে। বাচ্চারা খুব সহজে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে। তবে কিছু বাচ্চার এ কান্না অভ্যাসবশত হয়। তাও ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। কান্না শুনে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করবেন না। অবশ্য অনেক সময় শিশুর শরীর খারাপ থাকলেও সে ভীষণ ঘ্যান ঘ্যান করে। এদিকে নজর দেবেন। অসুস্থ শরীরে জোর করে স্কুলে পাঠাবেন না। শিশুর মানসিক বিকাশে যেমন স্কুল আজ সহায়ক, তেমনি মনে রাখতে হবে সে স্কুল যেন প্রথাগত স্কুল না হয়। ছোট শিশুর জন্য সে স্কুলই প্রয়োজন যেখানে পড়ার চাপ তাকে ভীত করবে না। ঘরে ফিরেই তাকে এক বোঝা হোমওয়ার্ক নিয়ে বসতে হবে না। শুধু কিছু নিয়ম-কানুন শেখাবেন। ব্যাস। কাটবে স্কুলভীতি। নিয়ম-কানুন বলতে নির্দিষ্ট সময় স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস গড়া। খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসা। হোক না সে শুধু ছবি আঁকার জন্যই। ক্ষতি নেই। শিখবে শৃঙ্খলা। হবে কিছুটা স্বাবলম্বী। অন্যদের সঙ্গে খেলে রং করে, ছড়া কেটে হয়ে উঠবে স্বতঃস্ফূর্ত।

শিশুদের মানসিক বিকাশে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তার কৌতূহল মেটানো। বাচ্চার কাছে সম্পূর্ণ অজানা এই জগতটাকে পরিচিত করে তুলতে বাবা-মা শিক্ষক সবারই ভূমিকা রয়েছে। তাই তার আবোল-তাবোল প্রশ্নে অধৈর্য না হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে তার কৌতূহল মেটাতে হবে। আর এজন্য বাবা-মার স্কুল নির্বাচনে উচ্চ মার্কের শিশুর মানসিক দিক নিয়ে আগে ভাবতে হবে। শিশুদের স্কুলভীতির পেছনে কিন্তু বাবা-মায়েরও কিছুটা দায় থেকে যায়। প্রথমত : একদম ছোট থেকেই এটা পড়ো, ওটা লেখো বলে শিশুকে বিরক্ত করে তোলেন। দ্বিতীয়ত : অন্য বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করা। যেমন অমুক ছেলে বা তমুক মেয়ে অংকে একশতে একশ' পেয়েছে। বা ফার্স্ট হয়েছে। তুমি কেন পারছো না?

মা-বাবার জানা উচিৎ, পরীক্ষায় প্রথম একজনই হয়। ক্লাসসুদ্ধ সবাই হয় না। আর এ রকম তুলনা করলে বাচ্চা কিন্তু হীনম্মন্যতায় ভুগবে, ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে উঠবে। আসলে স্কুলে পরীক্ষার নম্বর পাওয়া বড় কথা নয়। নজর দিন ঠিকমতো সব শিখছে কিনা সেদিকে।

শেখ আনোয়ার

বছর চারেকের বাচ্চাকে স্কুলে পাঠালে প্রথম প্রথম সে একটু কান্নাকাটি করবেই। প্রথমবারের মতো বাবা-মায়ের পরিচিত গণ্ডি ছেড়ে শিশু দিশেহারা হয়ে পড়ে

একটি শিশুর জন্য সেই স্কুলই প্রয়োজন যেখানে পড়ার চাপ তাকে ভীত করবে না -যুগান্তর

JAN 09 2002